তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৩৫

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম এমপি এবং নিউ এইজ সম্পাদক নূরুল কবির।

তারিখঃ ২৩-০৬-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশের বাইরে যে যেখান থেকে চ্যানেলটি দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক আজ ২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল। স্বাধীনতার উত্তরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সময় শাসন ক্ষমতায় থাকা দল এবং টানা বেশি সময় শাসন ক্ষমতায় থাকা দল। আর বিরোধীদল হিসেবে খুবই সক্রিয় যখন যদি দল ছিলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিজেকে কেমন ভাবে দেখে? বাইরে থেকে আওয়ামী লীগ দেখতে কেমন? এটি আজকে আমরা এই বিশেষ দিনে খোঁজার চেষ্টা করব কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায়ে বসে আছেন বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট শ. ম. রেজাউল করিম আমার ডানে রয়েছেন ইংরেজিতে নিউ এইজ সম্পাদক ইতিহাস চর্চা যার কাজে প্রধান বিষয় নূরুল কবির স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়। মিস্টার শ. ম. রেজাউল করিম আওয়ামী লীগের অর্জনই কি বিসর্জনই কি? প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী নিয়ে শুনতে চাই আপনার কাছে।

শ. ম. রেজাউল করিমঃ ধন্যবাদ আপনাকে নূরুল কবির ভাইসহ চ্যানেল আইয়ের অগণিত দর্শক শ্রোতাদের। আমি শুরুতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ২৩ শে জুন থেকে এ পর্যন্ত যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন বিভিন্নভাবে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রেখেছেন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কষ্ট স্বীকার করেছেন, যার ভেতর থেকে আওয়ামী লীগ একটা ইনস্টিটিউশনে

পরিণত হয়েছে। তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বিশেষ করে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক সাহেব, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এবং বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কথাটা বলছি। আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং পরবর্তীতে শেখ হাসিনা অনেকটা সমার্থক স্থানে পৌঁছেছে। অর্থাৎ আমাদের এই ভূমন্ডলে বাংলা ভাষাভাষী যারা তারা বিভিন্ন কারণে বিভাজিত ছিল কেউ মনে করতে আমি সনাতন ধর্ম অবলম্বী, কেউ মনে করত আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী, অন্যান্য ধর্ম অবলম্বী এগুলো একটা বিভাজন ছিল। সেই বিভাজিত অবস্থা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে যে তথাকথিত স্বাধীনতা এসেছিল সেই স্বাধীনতা আসাটাই স্বাধীনতা ভেতর থেকে পরাধীনতা নিহিত ছিল। মানে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল পাকিস্তানের মৃত্যুর একটা কবর রচনা করা হয়েছিল। কারণ কোন ধর্ম ভিত্তিক দেশ হতে পারে না। অন্তত আমাদের এই দেশের প্রেক্ষাপটে সেখান থেকে কিন্তু অনুভূত হতে থাকে যে এটা বাঙ্গালীদের কে আলাদা করে তাদেরকে সংকীর্ণ জায়গায় রাখার একটা চেষ্টা হলো কিনা। এর পর পর কিন্তু নুরুল কবির ভাই আছেন ইউ ক্যান বেয়ার মি ইরানের সঙ্গে একটা কনফেডারেশন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যে পাকিস্তান-ইরান মিলে একটা কনফেডারেশন করবে। তখন আজকের যে বাংলাদেশে এই অঞ্চলের মানুষের অনুভূতি টা আসলো যে আমরা এমনই যে পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান মিলে সেখানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষী। ইরানকে আনা হয় ইরানের ভাষার সঙ্গে পাকিস্তানের ভাষার সামঞ্জস্যতা রয়েছে। তাহলে আলটিমেটলি ভাষার দিক দিয়ে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো দূরের কথা সংখ্যালঘিষ্ঠ না আমাদের অস্তিত্বহীন অবস্থায় এসে যাবে। সেখানে একটা সোচ্চার অবস্থা হওয়ার কারণে কিন্তু ইরানের সঙ্গে কনফেডারেশন করা সম্ভব হয়নি। করতে পারে নি। প্রথম একটা যুবলীগ নামক গণতান্ত্রিক যুবলীগ ফ্রন্ট তৈরি করা হলো যে অঞ্চলের একটা নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। সেটা খুব ভালো গতিতে আগাবার পরেই কিন্তু ১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগঠন গঠন করা হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অরগানাইজেশন থাকতে হবে। কিন্তু সেটা ছিল ছাত্রসংগঠন এর পরবর্তীতে কিন্তু ১৯৪৯ সালের ২৩ শে জুন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুল হকের নেতৃত্বে অন্যান্যরা সম্পৃক্ত ছিলেন প্রথম যে আওয়ামী লীগকে গঠন করা হয় তার টার্মের সাথে মুসলিম শব্দটা ছিল। তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক ঘটনার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি কারাগারে। কারাগারে থাকা অবস্থায় তাকে জয়েন্ট সেক্রেটারি করা হলো আওয়ামী লীগের। জয়েন্ট সেক্রেটারি থাকার কারণে কিন্তু তিনি সোচ্চার থাকলেন ভেতর থেকে ভাষা আন্দোলন শুরু হলো। এরপর তিনি যখন মুক্তি পেলেন, মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সরাসরি রাজনীতিতে

সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন। সরাসরি রাজনীতিতে পূর্বেও যেভাবে করতেন কিন্তু এখন একটা সাংগঠনিক ব্যানারে তিনি সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন। তখন একটা পর্যায়ে কিন্তু তাকে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এই কারণে করা হয় যে তৎকালীন সময়ে সম্পাদক শামসুল হক তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক থেকে তিনি ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার ধারাবাহিকতা ১৯৫৭ সালে যখন আমি ১৯৫৭ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধুর পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলাম। সেখানে পার্টি থেকে মুসলিম লীগ শব্দটি উঠিয়ে দাওয়া নিয়ে এবং সিকান্দার মির্জার সঙ্গে কিছু বিষয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত অনুভূতি আসলো যেটা আমি আবুল মুনসুর সাহেবের লেখা থেকে পেয়েছি কারণ তিনি সোহরাওয়ার্দী কেবিনেটের একজন মেম্বার ছিলেন তার যেই লেখা সেখান থেকে আসছে যে সে ঘটনায় মাওলানা ভাসানীকে হত প্রভাবিত করতে পেরেছিল কি না হয়তো এই সংশয়টা তিনি ব্যক্ত করেছেন। এর ফলে তিনি আলাদা একটি সংগঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি। ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টি তিনি যখন করে চলে যান তখন কিন্তু মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ নেতৃত্বে চলে আসেন এবং বঙ্গবন্ধু তখন ও সেক্রেটারি থাকেন। আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালে কিন্তু সামরিক শাসন জারি হল সিকান্দার মির্জার। সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতায় কিন্তু আওয়ামী লীগ সম্মেলন করতে পারল না। এরপর আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশকে পূর্ণাঙ্গ আওয়ামী লীগের সভাপতি করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক হন। পরবর্তীতে তাজউদ্দিন আহমেদ পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় নেতৃত্ব বিকশিত হতে থাকে। এখন অর্জনের জায়গাটা হল অঞ্চলের মানুষের জন্য একটা স্বাধীকার স্বতন্ত্র বাসভূমি, স্বাধীনতা তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময় অনেকের আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে। এটা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ অনেক নেতৃবৃন্দ দেখেছেন কিন্তু সুসংগঠিত করে এই যে বিভিন্ন ধর্মে বিভাজিত ব্যক্তিদের একটা ফোরামে আনা।এই ফোরামটা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদটাকে তৎকালীন শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে ধারণ করে একত্রিত করতে পেরেছিলেন তখন রক্ষণশীল মুসলিম লিডার যারা আওয়ামী লীগের ভিতরে ছিল তারাও রক্ষণশীল মুসলিম লীগ মানসিকতার যারা ছিল তারা বললেন যে না ইয়ে হচ্ছে কমিউনিস্ট মনা। এরে কোথাও নেয়া যাবে না। তার খেসারত কিন্তু তাকে দিতে হলে একটা জায়গায় ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পরে বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু কেবিনেটের সদস্য করার ক্ষেত্রে তারা বাধা দিলেন যে না উনি হচ্ছে কমিউনিস্টের প্রতিনিধিত্ব করেন। উনার অ্যাটিটিউডটা এরকম। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার পরে

তারপর যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করা হলো এখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু কেবিনেটে আসলেন। সেখানেও কিন্তু তাকে আওয়ামী লীগের ভিতরে থাকা একটি অংশ তাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলতো উনিক একটু বেশি অ্যাডভান্স কিনা, একটু বেশি রেডিক্যাল কিনা। এরকম অবস্থা কিন্তু মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাকে যখন বললেন যে একটা দায়িত্ব নিতে হবে আয়েদার ইট উইল বি লিডার অফ দা পার্টি অর পার্ট অফ দা গভারমেন্ট। যে তুমি কি মন্ত্রিত্বে থাকবা না দলে আসবা। উনি নির্দ্বিধায় বললেন যে না আমি মন্ত্রিত্ব ছাড়বো, আমি দলে থাকতে চাই। এভাবে কিন্তু দলের দায়িত্বটা তিনি গ্রহণ করলেন। তারপর ধারাবাহিকথায় কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তিনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দিলেন। এই পথ পরিক্রমায় আপনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন বলেন প্রথম সূতিকাঘাতটা উনি সবচেয়ে প্রকাশ্যে নিয়ে আসলেন সিক্সটি সিক্সয়ে ছয় দফা টাকে সামনে নিয়ে আসার ভেতর থেকে। যদি অনেকে তখন বুঝেন নাই কিন্তু পাকিস্তানিরা ঠিকই বুঝেছিলেন যে ছয় দফাটা হচ্ছে এটা কোন দফা না এটা হচ্ছে আলাদা স্বতন্ত্র বাসভূমি তৈরি করার জন্য শেখ মুজিবের সুপরিকল্পিত একটি অধ্যায়। সেদিন কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী কিন্তু ছয় দফাকে নিয়ে বিরোধী দলে অনেক কনভেনশন উত্থাপন করতে চাইলেন। সেখানে বাধার মুখোমুখি হলেন। বাংলাদেশের সেটি ইউনি করলেন। বাংলাদেশ করার পরে আওয়ামী লীগের ভিতরেও কিন্তু একটা অংশ বলছিলেন যে না এই ছয় দফা ঠিক হবে না। শেখ মুজিবুর খুব রিজিত ছিলেন যে এই ৬ দফার মধ্যে সমস্ত অধিকার নিহিত আছে। অতএব ছয় দফাকে ঘিরেই করতে হবে। তখন সারা বাংলাদেশে ঘুরে বাঙালি জাতিকে ওইযে জাতীয়তাবাদী ফোরামের নিয়ে আসার কারণে কে হিন্দু-কে মুসলমান এটা থাকল না নামটা হয়ে গেল আমরা সবাই বাঙ্গালী। এভাবে কিন্তু ধারাবাহিকতায় ভেতর থেকে বাঙালি জাতিকে অধিকার বোঝালেন শোষণের কথা বোঝালেন সম্মোহিত করতে পারলেন সেভাবেই কিন্তু গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য থেকে বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ দিতে পেরেছেন। এস আ হোল সংক্ষেপে যদি বলা যায়, বাংলা ভাষাভাষীদের বিশেষ করে এই অঞ্চলের মানুষের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যা কিছু সবচেয়ে বড় অর্জন সমস্ত বড় অর্জন এসেছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে। এর জন্য আওয়ামীলীগ, বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু এবং আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা অনেকটা সমর্থক অবস্থানে এসে পৌঁছেছে।

জিল্লুর রহমানঃ বিসর্জন আছে কিছু?

শ. ম. রেজাউল করিম এমপিঃআওয়ামী লীগের বিসর্জন আছে আমার কাছে আমার কাছে আমি যে নাগরিক হিসেবে যেহুত আমি গভর্মেন্টের...

জিল্লুর রহমানঃএ পর্যায়ে যদি বলতে চান ছোট্ট করে।

শ. ম. রেজাউল করিমঃ বিসর্জন আছে আওয়ামী লীগ যে স্বপ্ন নিয়ে বাঙালি জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল সেই ক্ষেত্রে আমরা সুসংগঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুকে নিরাপত্তা দেওয়া দেশের উগ্র অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করেছিলেন যারা দেশের ভিতরে আওয়ামী ঘরানার এক শ্রেণীর লোকেরা আবার স্বাধীনতাবিরোধীরা ছিল তাদের যে মোকাবেলা করে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে পারিনি উন্নয়নের ধারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে ব্যাহত হয়েছে ৭৫ এর পরে দীর্ঘদিন যাবত এটা না পারার ব্যর্থতা আওয়ামী লীগের আমি বলব সেই জায়গা।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার নুরুল কবির আওয়ামী লীগকে এই ৭২ বছরকে কি আপনি একভাবে দেখবেন না পর্যায়ক্রমিকভাবে কখন কোথায় এগিয়েছে কখন কোথায় পিছিয়েছে সে ভাবে দেখতে চান?

নূরুল কবিরঃ আমার মনে হয় সেটা বেটার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচাইতে পুরনো রাজনৈতিক দল। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এগুলো মধ্য দিয়ে পার্টি এগিয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে তারপর অনেক বছর গেছে এখানে ৫০ বছর হয়েছে। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় পৃথিবীর যে ব্যক্তি যেমন, সমাজ যেমন একইরকম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও তেমনি। নানা ধরনের ফেইজের মধ্য দিয়ে যায় কতগুলো ফেইজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থাকে কখনো কখনো হোঁচট খায়। কখনো কখনো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আবার ওঠে। এরকম নানা পর্বের মধ্য থেকে আওয়ামী লীগ অগ্রসর হয়েছে এবং এত বছর পরে ৭২ বছরের সময় আওয়ামী লীগ যদি এখনও ক্ষমতায় আছে কিন্তু কতগুলো নতুন চ্যালেঞ্জ ও তার সামনে উপস্থিত আছে। আমি যদি বলতে চাই যে আওয়ামী লীগ শুরু হয়েছে আপনার আর একটু আগে। ১৫০ মোবেইলটলি বলে একটা জায়গা ছিল যেখানে মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীরা যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন যারা মনে করতেন যে এখানে পাকিস্তান আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত না হলে এখানকার পূর্ববঙ্গের মানুষ বিশেষত তাদের মুক্তি কোন সম্ভাবনা নাই। তারমধ্যে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর ঢাকাকেন্দ্রিক কিছু ছিলেন, কিছু ছিলেন কলকাতা কেন্দ্রিক। তারা ওয়ার্কার্স ক্যাম্প নামে ১৫০ মোবেইলটলিতে একটা অফিসার সেখানের মধ্যে যাদের উদ্যোগে এটা হয় তার মধ্যে শামসুল হকের কথা বলেছেন। শামসুল হক ছিলেন। তারপরে আপনার অফকোর্স মুজিব

এসে পরে জয়েন করেন। খন্দকার মুশতাক এখানে ছিল, নঈম উদ্দিন আহমেদ ছিল। শামসুদ্দিন আহমেদ বলে পরে একজন এমএলএ ছিলেন। এরা হল একটা তরুণ গ্রুপ। তরুণ গ্রুপের সঙ্গে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরপরই নাজিমুদ্দিন আকরাম খাঁ পুরনো যারা নেতা পুরনো ঘরণার খাজা পরিবার ভিত্তিক যে ওয়েস্টার্ন ইন্টারেস্টের যে মুসলিম লীগ তাদের সঙ্গে চিন্তার অমিল দেখা যেতে থাকে। কারণ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর পরই নাজিমুদ্দিন গ্রুপ এবং আকরাম খাঁ গ্রুপ অগণতান্ত্রিক আচরণ করতে থাকে। এবং কেন্দ্রীয় যে পাকিস্তান নেতৃত্ব সেটাও বিশেষত করে একটা বড় যুবকের প্রতিষ্ঠান ছিল। আপনার সেই প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল গার্ড। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পরে এটা ভেঙে দেওয়া হয়। ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান নেতা ছিলেন জহিরুদ্দিন পরে আওয়ামী লীগের বড় নেতা হয়েছিলেন। কতগুলো ঘটনা অগণতান্ত্রিক আচরণ, তরুণদের কথা মনোযোগ দিয়ে না শোনা এবং গার্ডটা ভেঙে দেওয়া যেটা সংঘটিত শক্তি ছিল। সেটাতে তরুণরা প্রথম মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে ন্যায্য ভাবে আপনার সন্দেহ করা শুরু করে। সেই তিক্ততাটা একটা পর্যায়ে ব্যাপক রূপ ধারণ করে এখন বায় ইলেকশন রোড টাঙ্গাইল বাই ইলেকশন এপ্রিলের ১৯৪৯ সালে সেখানে মাওলানা ভাসানী পদত্যাগ করেছিলেন। মওলানা ভাসানি তখন পূর্বপাকিস্তানে ছিলেন। উনি আসার মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু তাকে নানানভাবে ষড়যন্ত্র করে যখন তার সিট চলে যাবে মনে হচ্ছে তখনই পদত্যাগ করেন। তখনই খুররম খান পন্নী মুসলিম লীগের অফিশিয়াল ক্যান্ডিডেট হন। এইযে তরুণরা মোবাইলটলির ক্যান্ডিডেট যারা একত্রিত হয়েছে যাদের আবেগ উদ্দীপনা যৌবনের শক্তি এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং তারা এটা কোন সংবলিত রূপ ছিল না। মোবাইলটলি ওয়ার্কার্স ক্যাম্প এখানে সুখ-দুঃখের কথা বলতো। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতেন এরা। তারা শামসুল হককে ক্যান্ডিডেট বানিয়ে দিলেন এবং অফিশিয়াল মুসলিম লীগ ৪৭ তাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান হয়েছে। এবং ৪৮ সালে এপ্রিল মাসের নির্বাচনে এই তরুণ গ্রুপ সারাদিন কাজ করেছে।

জিল্লুর রহমানঃ ৪৮ না ৪৯ সালে?

নূরুল কবিরঃ ৪৯ সালে। তরুণ গ্রুপ সারাদিন কাজ করে আপনার খুররম খান পন্নীর এগেনস্টে তাকে শামসুল হককে পাস করে নিয়ে আসা হলো। তারপর শামসুল হককে ঠিকমতো বসতে দেওয়া হয়নি। নানারকমের ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে আমি সংক্ষেপে শুধু বলব যে, যেটা অলরেডি রেজাউল ভাই বলেছেন কিছুটা তখন মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে আসাম থেকে চলে আসছেন আপদমস্তক একটা পলিটিকাল ল। এটা নতুন ভাবে এই গ্রুপটা নতুনভাবে সংঘটিত হতে চাইছে। তখন একটা কনফারেন্স ডাকেন সেটার নাম ছিল মুসলিম লীগ ওয়ার্কার্স

কনফারেন্স। এই যে জুন মাসের ২৩,২৪ তারিখে। সেই জুন মাসের ২৩ তারিখ থেকে যে কমিটি হয় সেটাও কিছুটা বলেছেন সামান্য একটা আসলে ঐখানের যুগ্ম-সম্পাদকের কোন পথ ছিল না প্রথম কনস্টিটিউশনে। সেক্রেটারি আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মওলানা ভাসানি প্রেসিডেন্ট হলেন। শামসুল হক এই সেক্রেটারি হলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন ৫জন এক নম্বর আতাউর রহমান, আমজাদ আলী খান, তারপরে আব্দুস সালাম খান, শওকত হোসেন এরা প্রেসিডেন্ট হলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন তিনজন খন্দকার মুশতাক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং রফিকুল হোসেন বলে একজন রয়েছিলেন ৪-৫মাস পরেই তিনি ওখান থেকে চলে যান। আপনার কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান। তো এইটা হওয়ার পর আওয়ামী লীগের মোটাদাগের একটা ফেইস হচ্ছে বলা যেতে পারে ১৯৪৯ সাল থেকে ৫৭ পর্যন্ত একটা ফেইস। এখানে অনেকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইতিহাসের পর্বে ঘটে। আওয়ামীলীগ সেখানে আওয়ামী মুসলিম লীগ তখন ৫৫ সালের আগ পর্যন্ত প্রধান রাজনৈতিক এক্টর। সেই অর্থে এই দেশে প্রথম বিরোধী দল বা আধুনিক বিরোধী দলও কিন্তু আওয়ামী লীগ। এই গ্রুপ টাই শেষ পর্যন্ত বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৫০ সালে আপনার একটা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়েছিল সেটার কারণ হচ্ছে পাকিস্তান যখন তৈরি হলো তখন মার্চের ৪৯ সালের সংবিধানটা কি হবে। এই সংবিধান টা কি হবে তার জন্য একটা অবজেক্টিভ রেজুলেশন নেয়া হলো। কিছু বেসিক প্রিন্সিপাল ঠিক করা হলো। সেই বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটি যখন পাকিস্তানের কনস্টিটিউশন নিয়ে কাজ করছে তখন এই অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক কর্মী, নেতারা বিশেষত পার্টি হিসেবে আওয়ামী লীগ আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি আছে। তার কিছু দু-একটা ফ্রান্ট-টারান্ট আছে। তারা বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটির দেখল যে পরিষ্কার ভাষায় এটা ভয়াবহ। ভয়াবহ ইস্ট পাকিস্তান এর জন্য তৎকালীন এটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতির যে বৈষম্য তৈরীর যে ব্যবস্থা এটা গ্রহণযোগ্য নয়। তখন ৫০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনফারেন্স হল একটা। আওয়ামী লীগ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। কামরুদ্দিন আহমেদ নামক অত্যন্ত তখনই একটা জাতীয় লিগ করেছিলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথমদিকের যারা তাত্ত্বিক, বুদ্ধিজীবী এইখানকার আওয়ামী লীগের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল। পরে কিছুদিন আওয়ামী লীগের থেকে অ্যাম্বাসেডরও ছিলেন সরকারের। বাঙালি জাতীয়তাবাদ তারা গ্র্যান্ড কনফারেন্স করে একটা বিকল্প প্রস্তাব দিলেন। এই বিকল্প প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত এর বাইরে আসলে মৌলিকভাবে এর বাইরেও যে প্রস্তাবগুলো ছিল এর বাইরে তেমন কোনো নতুন দাবিদাবা আসেনি। যেমন তারা বলেন লিয়াকত আলী খান যখন বললেন ইসলামিক রিপাবলিক হবে

এখানকার বাঙালিরা বললেন এই যে গ্র্যান্ড কনফারেন্স হলে এটার নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র এবং দুই পক্ষে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে যেটা আর ৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব যেখানে দুটো স্টেট হওয়ার কথা ছিল যেটা ৬ দফার মধ্যেও দেখবেন। রিজিওনাল অটোনমিক কথা যখন বললেন সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলা হলো সেন্টারের কাছে দুইটা মাত্র ক্ষমা একটা হচ্ছে প্রতিরক্ষা আরেকটা হচ্ছে ফরেন আফেয়ারস। আর যত ক্ষমতা একটা রাষ্ট্রের থাকে দুইটার মধ্যে থাকবে। তারা আপনার আরেকটা যেটা কথা বললেন সেটা হলো রিজিওনাল আর্মির কথা বললেন। একটা সেন্টার আর্মি থাকবে কিন্তু দুই পাশে দুইটা রিজওয়ানার আর্মি থাকতে হবে। পাকিস্তানের এইটা মানে নাই। তারপরে ৫২ সালে ভাষা আন্দোলন গেল। ৫৪ নিবাচন আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফেইস আওয়ামী লীগের জীবনে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনে। ৫৪ সালের নির্বাচনে যে ২১ দফার কর্মসূচি সেই ২১ দফার ১৯ তম দফা যদি আপনি দেখেন সব জায়গায় পাওয়া যাবে এইযে ফোর সেডিং বাংলাদেশ আপনি ৬ দফার মধ্যে যা যা আছে। প্রথমে হচ্ছে গ্র্যান্ড কনভেনশনের ওই রেজুলেশনটা তারপরে হচ্ছে ১৯ দফার ২১ নম্বর কর্মসূচির ১৯ নম্বর দফায় পরিষ্কার ভাবে বলছে যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন। মুদ্রানীতি আলাদা করতে হবে দুই পাকিস্তানের জন্যে। প্লাস একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া রিজিয়নের মধ্যে এই ক্ষমতা থাকবে। সেটা ভিত্তিতে বাংলাদেশের মানুষ তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষ ইলেকশনের জিতল। জেতার পরে আপনার ৫৭ সাল পর্যন্ত আরেকটা ফেইজ যেখানে ভাঙলো। এই ভাঙার জায়গাটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা সঙ্গে যে সমস্যাটা তৈরি হলো সোহরাওয়ার্দী, সোরওয়ার্দী সমস্যাটা হলো- পাকিস্তানের সোহরাওয়ার্দী ৫৬ সালে মন্ত্রী হলেন। প্রধানমন্ত্রী হলেন। হওয়ার পর আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে সামরিক জোটের সঙ্গে পাকিস্তান যাবে কি যাবে না এখানে আওয়ামী লীগের তারপর সম্মেলনের, পার্লামেন্টারি পার্টের রেজুলেশন ছিল যাবে না। সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই সিয়াটো সেন্টার এন্ডোস করল। পররাষ্ট্রনীতি আমেরিকা কেন্দ্র করে ফেললেন এবং তিনি ততদিনে জিরো প্লাস, জিরো প্লাস,জিরো। সবচাইতে বড় কথা আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং আওয়ামী লীগের প্রথম দিন থেকে যে কথাটা পরিষ্কার ছিল স্বায়ত্তশাসন। পূর্ববাংলা যেন পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর উনি কাগমারিতে বলেছেন এবং ঢাকায় পল্টনের মিটিংয়েও বলেছেন যে ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন হয়ে গেছে। এটা একটা হিস্ট্রিতে অত্যন্ত মিস্ট্রি যে সোহরাওয়ার্দী সঙ্গে শেখ মুজিবের রিলেশন যতটা না পলিটিক্যাল তারচেয়ে বোধহয় ইমোশনাল ছিল। কারণ পুরনো পরিচয়ের কারণে। মুজিব কখনোই স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছাড়েন নাই। একদিনের জন্যও না ওই দুই বছর ছাড়া। এবং ৬৩ সালের নভেম্বরে যেদিন সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন এক মাসের মধ্যে ৬৪ সালে আওয়ামী লীগকে

আলাদা করে রিভাইভ করেন মুজিব। এবং প্রথমেই ওই দুইটার দাবি ওই ঝান্ডা আবার তোলেন। এটা সোহরাওয়ার্দী সময় হয়নি। সোহরাওয়ার্দীকে এই অঞ্চলে বেঙ্গল পলিটিক্সের জন্য তারা অনেক অবদান আছে। ইস্ট বেঙ্গল পলিটিক্সের ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক। বাংলাদেশে এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে যায় না যেমন ওই যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন প্যারিটি করলেন। প্যারিটি হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট পাকিস্তান দুই পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তাদের এক ইউনিট করে ধরা হতো। এটা অত্যন্ত অন্যায় একটা সিদ্ধান্ত। ৯৮ পার্সেন্ট স্বায়ত্তশাসন হয়ে গেছে। এটা একটা অত্যন্ত অন্যায় মন্তব্য। তার মৃত্যুর পরে এই ফেইজটাতে আওয়ামী লীগ ওই পুরনো দাবি সেখানে আসলে ন্যাপের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তারপরও পানি অনেক গড়িয়েছে নানা ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তাদের আর একক কর্তৃত্ব হয় নাই। এরপর ৫৮ সালে তো মার্শাল ল এলোই। ৬ পয়েন্ট যেটা এটার যে ধারাবাহিকতা আপনার গ্র্যান্ড কনভেনশনের, আপনার বিকল্প প্রস্তাব, ২১ দফার ১৯ নম্বর দফা তারই ধারাবাহিকতা একটা দেশের যে কোন সমাজে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে ওই মাটির ভেতর থেকে, সমাজের ভেতর থেকে, রাজনীতি ভেতর থেকে উঠে আসতে হবে। এবং ছয় দফা তা সেভাবে উঠে এসেছে এবং মানুষের মধ্যে ন্যাশনাল দাবি উনি রাইটলি বলেছে আপনার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ঠিক পাশাপাশি একটা ১৪ দলও ছিল ন্যাপের ঐগুলি প্লাস শ্রমিক-কৃষকের কথা ছিল আরেকটা কিন্তু ততদিনে ন্যাপের মধ্যে নানা প্রবণতা, বামপন্থীদের মধ্যে ভাঙ্গার প্রবণতা, মস্কো ফ্রিকিং, লড়াই ইতিমধ্যে ন্যাপ দুর্বল হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ এই দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে এই দেশের সবচেয়ে বড় পার্টিতে পরিণত হতে চলেছে তখন যেটা পরিপূর্ণ লাভ করে ৬৯ সালে। আপনার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সেই ষড়যন্ত্র মামলায় মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে গণ অভ্যুত্থান তৈরি হলো ছাত্র সংগ্রাম গড়ে উঠলো সবগুলো ছাত্র সংগঠন নিয়ে। ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগ। তারপর ৭০ সালে ইলেকশন। ৭১ সালে আরেকটা অত্যন্ত ক্রিটিকাল, গুরুত্বপূর্ণ সময় আওয়ামী লীগ পার করেছে। পাকিস্তানিরা মুজিবকে গ্রেফতার করবার পরে তাজউদ্দীন যদি না থাকতো তাহলে সেটা কি হতো আমরা জানি না। এ কথা পুরোপুরি পূর্ণ ভাবে সত্য এবং এর মধ্যে দ্বিধার কোন স্কোপ নাই যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়েছে রাজনৈতিকভাবে। কিন্তু আওয়ামীলীগ ৭১ সালে কলকাতায় এবং দিল্লিতে বহুভাগে বিভক্ত ছিল। তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকারকে বহুভাবে অনেকগুলি গ্রুপ ডিস্ট্রিক্ট করেছে সেইখানে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে এটাকে সামলানো সত্যিকার অর্থে ডে টু ডেটে নেতৃত্ব দেওয়া এবং শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে তার স্বর্ণ দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন।

তারপর যে যুদ্ধের পার্ট তিনি তো সেখানে ছিলেন না তার নামে যুদ্ধ হয়েছে। তো ডে টু ডে লিডারশিপের ব্যাপার থাকে। এই কন্ট্রাডিকশন গুলো যেভাবে হ্যান্ডল করেছে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগের একটা অপরাধ হচ্ছে যে তাকে সেই পরিমাণ এর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ওই সময় মুশতাক থেকে শুরু করে আরো অনেকের নাম আছে যারা নানান গ্রুপের তাজউদ্দিনকে এমন কি হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি কাছে যে তার এই সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করো। সেই পাওয়ার পর্বটা যে পার করতে পেরেছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে এখানে তো আওয়ামী লীগের প্যারালাল আর কিছু হতে পারে না বাংলার ইতিহাসে।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার রেজাউল করিম। এই পার্ট নিয়ে কি কিছু বলবেন না অন্য…

শ. ম. রেজাউল করিমঃ এই পার্টে একটু আসি সেটা হল কবির ভাই অনেক ধারাবাহিকতা নিয়ে আসছেন অনেক তথ্যবহুল অনেক কিছু । ৬৪ সালে ২৫ শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো। ড্রেগ থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো। ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা হল এবং ১১ ই মার্চ কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলেন। সেখানে কিন্তু যারা ওই যে ছয় দফা কনসেপ্ট যেটা আসলে ছয় দফা এবং অন্যান্য দাবিগুলো যে ছিল সেই দাবিগুলো নির্যাসে ছিল ছয় দফা। সেখানে কিন্তু যেটা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় তখনও কিন্তু একটা পক্ষ প্রগতিশীল রাজনীতির নাম দিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন। তারা বলছিলেন যে না এটার দরকার নাই এটা এভাবে হবে, কে বলছিলেন যে না যেটা চলছে এটা তো এই অবস্থায় চলছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর যে একটা অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল সে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তার যে একটা গ্রুপ তিনি তার সহকর্মী করেছিলেন এর ভেতরে মোশতাক সাহেব তো ইভেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী যখন বঙ্গবন্ধুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেন তখনি কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমেদের ক্লেইম ছিল যে আমি সিনিয়র আমাকে দায়িত্ব দিতে হবে। কিন্তু আমার যেটা এখন মনে হয় আমার রাজনৈতিক ধারণায় এখন মনে হয় যে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী যথার্থই বুঝেছিলেন যে সিনিয়ারিটি মূল বিষয় সংগঠক কে হতে পারে সেজন্য কিন্তু কাজী জাফর আহমেদের সঙ্গে তার একটা কনভারসেশন এর একটা লেখা পেয়েছি। সেখানে তিনি বলছেন এটি দৈনিক সংবাদে ছাপানো হয়েছিল। সেখানে তিনি বলছেন যে আমার জীবনে অনেক সেক্রেটারিয়ান পেয়েছি, ফোরামে পেয়েছি, দলে পেয়েছি বিভিন্ন…

নূরুল কবিরঃ ১১ টা

শ. ম. রেজাউল করিমঃ এগারোটা কিন্তু শেখ মুজিবের মত কম্পিটেন্ট, তার মতো দৃঢ়তা, তার মত আদর্শিক এবং মানুষকে সম্মোহিত করার মতো সেক্রেটারি তোমরা অনেকেই কিন্তু হতে পারো নাই। তখন কিন্তু কাজী জাফর সাহেব বলেছিলেন যে তাহলে হুজুর আমাদের তো থাকার দরকার। বলে না তোমার জায়গায় তুমি আছো শেখ মুজিবের জায়গায় শেখ মুজিব থাকবে। আজকে সে আমাদের রাজনীতিতে নাই কিন্তু যার যে যোগ্যতার জায়গাটা সেটা রাখা হবে। একটা কথা বলছেন যে তাজউদ্দিন আহমেদের আমি নিজেও যতটুকু ব্যারিস্টার এম আমিরুল ইসলাম এবং অন্যান্য যারা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাদের কাছ থেকে শুনেছি যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সরকার কে বিভাজিত করা, কেউ গোপনে পাকিস্তানের সাথে একটা কনফেডারেশন করা যায় কিনা, কেউ আমেরিকায় যে সম্পর্ক সেটা সৃষ্টি করা যায় কিনা, এরকম একটা প্রক্রিয়া ছিল। কেউ বিপ্লবী সরকার নাম দিয়ে গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। তখনই কিছুই ইয়াং লিডারদেরকে যারা নানানভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সাথে তাদেরকে দিয়ে আলাদা একটা কিছু করবার চেষ্টাও করেছেন। তো সেই জায়গায় খুব দ্রুততার সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমেদ ধারণ করেছেন।

নূরুল কবিরঃ দৃঢ়তা এবং ধৈর্য।

শ. ম. রেজাউল করিমঃহ্যাঁ বলছি তাজউদ্দিন আহমেদ কিন্তু নোট অ্যালোন তার একটা কনসেপ্ট কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত যারা সহকর্মী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ কিন্তু ৩ টার্মস বঙ্গবন্ধুর সেক্রেটারি ছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট তাজউদ্দীন তিনটা টেনিউরে সেক্রেটারি ছিলেন। এই সেক্রেটারি থাকার সময় বঙ্গবন্ধুর থাকাকালীন সময়ে যারাই সেক্রেটারি ছিলেন তাজউদ্দীন সাহেব এবং বঙ্গবন্ধুর কমিটির তাজউদ্দিন আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর দুজনার ভিতর যে সামঞ্জস্যপূর্ণতা এবং সম্পর্কের সুরীদ অবস্থান ছিল এটা কিন্তু অনেকের সঙ্গে হয়নি। বলে আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের জায়গাটা তাজউদ্দিন আহমেদ এর ভিতরে প্রবাহিত হয়েছিল। তার কারণ তিনি খুব কাছে থেকে বঙ্গবন্ধু কে দেখেছে সে জন্য তিনি পড়েছেন এখন তাহাজ উদ্দিন আহমেদকে রিকগনিশনের ক্ষেত্রে আমার জায়গা থেকে যতটুকু আমার স্টাডি কখনই কম করা হয়নি। আওয়ামী লীগের যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাজ উদ্দিন সাহেবকে সামনে নিয়ে আসেন। আমাদের আওয়ামী লীগের কনফারেন্স হতে গেলে কিন্তু মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ তারপরে অঙ্গসংগঠন করছেন। এখনো কিন্তু আওয়ামী

লীগের যেকোন কনফারেন্সে আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, আব্দুর রশিদ,তর্কবাগীশ থেকে শুরু করে নেতৃস্থানীয় যারা তাদেরকে কিন্তু একেবারে সন্মুখে নিয়ে আসে। ওইযে শ্রদ্ধার জায়গাটা এখানে রাখা। কাজেই তাজ উদ্দিন সাহেবকে সম্মানিত ওই ভাবে করা হয়নি এই যে বিষয়টা এটা সঠিক না। বর্তমান সরকারও কিন্তু তাজ উদ্দিন সাহেবের পরিবার শেখ হাসিনার সরকার তার পরিবারের সদস্যদের ক্যাবিনেটে রেখেছেন। পার্লামেন্টে আছেন এবং যেকোন বিষয় কিন্তু তাদের সংবেদনশীলতার জায়গা তাজ উদ্দিন সাহেব নট অনলি তাজ উদ্দিন সাহেবের মিসেস সৈয়দ জোহরা তাজউদ্দীন খুবই ক্রান্তিকাল ১৯৭৭ সালে সেই সময় কিন্তু আওয়ামী লীগকে ডোর টু ডোর নিয়ে গেছে। এই ভদ্র এই মহীয়সী নারী বলবো। এবং যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন কিন্তু শেখ হাসিনা তাকে মায়ের মতো জায়গায় সম্মানের মতো জায়গায় রেখেছেন। এর জন্য এই পার্টটা ওই ক্ষেত্রে…

নূরুল কবিরঃ আমি একটা ছোট্ট উনার সংগে আমরা তর্ক-বিতর্ক করে তো লাভ নেই। একটা সুন্দর জিনিস এনিওয়ে। কিছু আমি একগ্রী করি কিছু করিনা হিস্ট্রি রাইটিং যদি আপনি দেখেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের সেখানে তাজউদ্দিন আহমেদের যেখানে থাকার কথা সেখানে নাই। আওয়ামী লীগের লাভ হয় না ক্ষতি হয়েছে। ভাসানী মুজিব সম্পর্কে ব্যাপারে উনি একটু বলেছেন আমি আরেকটু যুক্ত করি উনার সঙ্গে তাদের কেমিস্ট্রিটা কেমন ছিল ৫৩ সালে প্রথম যেই বছর উনি সেক্রেটারি হন তার এগেনস্টে যারা ছিল আরো ক্যান্ডিডেট ওরা বুঝতে পারছে যে শেখ মুজিবের সঙ্গে ওরা পারবে না। তাদের কেউ কেউ এটা মুজিব নিজেই লিখেছেন তার বইয়ে আছে কেউ কেউ আবুল হাশিমকে নিয়ে আসছিলেন সেক্রেটারি করার জন্য। আবুল হাশিম বেঙ্গল মুসলিম লীগের সেক্রেটারি। ভাসানী আসাম মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ছিল। কাজেই এটাতো দেখতে সুন্দর দেখা যায় কায়দা-কানুন করে তারে নিয়ে আসছে। হাশিম সাহেব গেছেন ভাসানীর সঙ্গে কথা বলতে যে আমাকে এরকম কোন প্রস্তাব কি কেউ তোমার পার্টি থেকে দিয়েছে। আমি রাজি আছি তবে আন কনটেস্টেড হতে হবে। উনি বলছেন যে আবুল হাশিম সাহেবকে যে ভাই আপনি যদি না সেক্রেটারি ক্যান্ডিডেট মুজিব হবে সে ইলেকশন করবে। এবং সে ইলেকশনে পাস করবে এবং এই সংগঠনে তার অনেক অবদান আছে। আপনি যদি চান আমার পদ আমি ছেড়ে দিতে পারি। এটা একটা অত্যন্ত এই যে আপনি বলছেন যে ১১ সেক্রেটারি মধ্যে কেন দলেরপ্রথম থেকে আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের মধ্যে যত নেতা আছেন অনেকেই বলছেন এদের কাছাকাছি মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুরের স্ট্রেচার এখনো বাংলাদেশ। তাদের কাছাকাছি কেউ

পৌঁছাতে পারেনি তার একটা মজার দিক আছে। অধিকাংশই তাদের মানে উপরের দিকে ফুলটাইম পলিটিশিয়ান ছিলেন মাত্র দুইজন আর সব আর্ম চেয়ার। ওকালতি অর্ধেক,অর্ধেক সাহিত্য, সংবাদিকতা অর্ধেক রাজনীতি এই দুইটা একজন ম্যাপে থেকে হোক আরেকজন আওয়ামী লীগ থেকে হোক মানুষের সঙ্গে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ৭১ সালে ওই ডায়লগের সময় অলমোস্ট ডেইলি তাদের সাথে কথা হত। এবং ১১ জন সেক্রেটারি বক্তব্যটি পাবলিকলি দিয়েছিলেন। সাতই মার্চে বক্তৃতা অনেকের পছন্দ হয় নাই যে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল। হয় নাই। ৯ তারিখ বক্তৃতায় উনি কথাগুলো বলছিলেন যে ওকে সন্দেহ করোনা ও বাঙালি। বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতারণা করবে না।

জিল্লুর রহমানঃ সো ৭২ বছরের আওয়ামী লীগকে নিয়ে ৬০ মিনিটের আলোচনায় আসলে অনেক কিছু হবে না আমরা ২২ বছরের আওয়ামীলীগের অর্জন যদি বলি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়া এই ৫০ বছরে তাদের অর্জন কি? আমার হাতে বেশি সময় নেই সো ছোট করে...

শ. ম. রেজাউল করিমঃ এই ৫০ বছরের অর্জনটা হচ্ছে আমি সিম্পলি একটা জায়গায় আসি দেখেন বঙ্গবন্ধু যখন আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পেলে একটা সময় তিনি পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব না ভারপ্রাপ্ত অবস্থা থাকার সময় তার ধারাবাহিকতায় কিছুদিন পরে কিন্তু শেরে বাংলা একে ফজলুল হক রাজনীতিতে কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তিনি চিকিৎসার নামে বাইরে চলে গেলেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী একটা আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে চলে গেলে। একটা বিপন্ন অবস্থায় পাকিস্তানের স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ গ্রাস রুট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় তখন না। সেই অবস্থায় আওয়ামী লীগের বোঝা কিন্তু তাকেই ক্যারি করতে হয়েছে। আর যেটা নূরুল কবির বললেন যে নানামুখী প্রতিকূলতার ভেতর থেকে দলের ভিতরে এবং দলের বাইরে তাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় চলে আসা আওয়ামী লীগকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে সকলের জন্য আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করা যে একটা দুঃসাধ্য ঘটনা ছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে ১৭ মে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন যখন করেন তখনো কিন্তু আওয়ামী লীগের বিপন্ন অবস্থা ছিল। আওয়ামী লীগের ভেতর গ্রুপিং ছিল এবং বাইরের যে পরিষদটা মানে তৎকালীন সময়ে যারা সরকারে তারাও কিন্তু ওই মুক্তিযুদ্ধের কনসেপটের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জায়গা থেকে তারা কিন্তু কিছুটা পাকিস্তানের স্টাইলে যেমন- স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে আসছেন বা যারা বিরোধিতা করেছিল মুক্তিযুদ্ধের তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাষ্ট্রীয়ভাবে। আমাদের দলের ভিতরে কেউ কেউ ওইসব জায়গায় যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নানাভাবে প্রতিকূল অবস্থার ভেতর

থেকে কিন্তু শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের হাল ধরতে হয়েছে। তখন কিন্তু তিনি তার অনেক চাচাদের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশা করেছিলেন সেই প্রত্যাশা পাননি। কেউ কেউ তো পরবর্তীতে ধরেন মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে একটা আওয়ামী লীগ হলো। তারপর মহিউদ্দিন আহমেদ এবং রাজ্জাক সাহেবের নেতৃত্বে বাকশাল তৈরি হলো। ডঃ কামাল হোসেন বেরিয়ে গেলেন। আওয়ামী লীগের কোরবান আলী সাহেব এরশাদ সরকারের সাথে যুক্ত হলেন। আওয়ামী লীগের অনেক ছাত্র নেতা ছিলেন ফজলুর রহমান পটল সহ অনেকেই তারা অন্যান্য রাজনীতিতে চলে গেলেন। ধাক্কা কিন্তু বহুবার আসছে। বঙ্গবন্ধুকে যেমন একটা বিপন্ন অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকেও কিন্তু সেই প্রতিকূল অবস্থা নিতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে যেমন গ্রেফতার হয়ে ফাঁসি মুখোমুখি হতে হয়েছিল। শেখ হাসিনাও কিন্তু ১৯ বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে লাস্ট হলো ২০০৪ এর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি অর্জন যেটা করতে দিয়েছেন সেটি হল বাংলাদেশের মানুষের টার্গেটটা ছিলো দুবেলা-দুমুঠো খেতে পারবে, পড়তে পারবে, শিক্ষার অধিকার যেটাকে সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয় জন্য যে অন্ন,বস্ত্র,বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা এইযে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং নাগরিকদের অধিকারটাে দেওয়া। আজকে বাংলাদেশে কোন মানুষ না খেয়ে থাকে না। আজকে শিক্ষাব্যবস্থা বিনা বেতনে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। আজকে বাংলাদেশের একটি মানুষ গৃহহীন থাকবে না তাদেরকে সকলের ঘরে ব্যবস্থা করে দেওয়া। শতভাগ বিদ্যুতায়িত রাষ্ট্র ব্যবস্থা করা। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা। বাংলাদেশকে একটা আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নয়নের রোল মডেলে নিয়ে আসা এই সক্ষমতাটাকে যে বাংলাদেশকে দিতে পেরেছে এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের সাফল্য। এখন হান্ডেট পার্সেন্ট সাফল্য সবক্ষেত্রে নয় এটা বলা ঠিক হবে না কিন্তু যে সাফল্যটা আসছে এটা অতীতে অনেকেই দায়িত্বে ছিলেন। কেউ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, কেউ রাষ্ট্রপতি ছিলেন, কেউ দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন সেই সময়ের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার যদি করা হয় এবং বাংলাদেশটা সৃষ্টির যে টার্গেট টা ছিল বঙ্গবন্ধু এবং তার যারা নেতৃত্ব ছিলেন তাদের ঘিরে সেই টার্গেটাতে ফুলফিল করার জায়গায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ কিন্তু সেই জায়গায় আসছে। শেখ হাসিনাকে কিন্তু একটা তরুণী অবস্থায় আওয়ামী লীগের দায়িত্বটা কাঁধে নিতে হয়েছে। দলের ভিতরে বিভাজন আবার সরকারের যখন আসলেন তখন কিন্তু খুব পরিপক্ক তিনি না। সেই সরকারে থাকা অবস্থায় কিন্তু অনেক প্রতিকূলতা তাকে মোকাবেলা করে আজকের বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করতে হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ নামক একটি ইনস্টিটিউট, তিনি তার বাবা তৈরি করেছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ অন্যান্যরা

ইনিশিয়েটিভে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা অন্য দলে চলে গেছেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে যেমন মোকাবেলা করতে হয়েছে। শেখ হাসিনাকেও মোকাবেলা করে আজকের এই বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করতে পেরেছেন এটাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের সার্থকতা।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার নূরুল কবির।

নূরুল কবিরঃ আপনার স্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বেশ কয়েকটি ফেইজের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যেতেন একেকটা সময় বৈশিষ্ট্য একেক রকমের। আমি এই জায়গাটা আসবো পরে। শেখ হাসিনার পিরিওড টাতে একটা নতুন পর্ব যেমন ধরুন আপনার ৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে যে আশা-আকাঙক্ষা তৈরি হয়েছিল এক, আরেকটা হচ্ছে ২৩ বছরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব মাওলানা ভাসানী থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব পর্যন্ত মানুষের মধ্যে যে আশা জাগিয়েছিলেন তার মধ্যে কয়েকটা কথা ছিল এক নম্বরে ভোটাধিকার, বৈষম্য বিলোপ, এইগুলো তো পুরা পাকিস্তান পিরিওডে আন্দোলনে মূল ছিল। আপনার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এগুলো করতে করতে পার্লামেন্টি ডেমোক্রেসি। ৭৫ সালে এসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনার কিভাবে দেখবেন সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু ইতিহাস এভাবেই লিখবে যে ইতিপূর্বে যত ধরনের রাজনৈতিক লিবারেল গণতন্ত্রিক আদর্শের কথা বলছেন ৭৫ সালে বসে ১০০ কারণ থাকতে পারে সেই ন্যায্য কিংবা অন্যায্য আপনার কতগুলো বড় ধরনের বাক পরিবর্তন বাংলাদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও, আওয়ামী লীগের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এবং আওয়ামী লীগের হলে সেটা বাংলাদেশের হয় বাংলাদেশের হলে সেটা আওয়ামী লীগের হয়। যেমন ধরুন এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা মুজিব পাকিস্তান আমলে চিন্তাও করে নাই কখনো। পরিষ্কার বক্তব্য আছে বইপত্র আছে যে অপজিশন ছাড়া, ভালো অপজিশন ছাড়া গণতন্ত্র বাড়ে না। দ্বিতীয় টা হচ্ছে যে আপনার মনে থাকবার কথা আপনি যদি ফোর আমেন্ডমেন্টটা দেখেন তাহলে পুরো জনগোষ্ঠীর উপরে সংবাদ সংবিধানের উপরে প্রেসিডেন্টকে স্থাপন করা হয়েছিল। সংবিধান চেঞ্জ করতে লাগতো টু থার্ড মেজরিটি। প্রেসিডেন্ট চেঞ্জ করতে লাগতো থ্রি ফরথ মেজরিটি। এটা একজন যত বড় মহান ব্যক্তি নিঃসন্দেহে উনি কিন্তু তাকেও গ্লোবাল ডেমোক্রেসির তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিকে পুরো সংবিধানে উপরে বসানো যায় না। এই কাজগুলো করেছিলেন। তারপর যে মর্মান্তিক নিশংস হত্যাকাণ্ড হলো সেটা মধ্য দিয়ে হ্যাঁ একদম খুশি হয়েছিল কিন্তু আমি মনে করি যে তাতে পরিবর্তন কি হয়েছে। একটা হচ্ছে এরকম একটা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু এক দলীয় শাসন থেকে আমরা তো সামরিক শাসনের এক ব্যক্তির

শাসন এগিয়ে পড়েছিলাম। তাতে তো কোন উপকার হয় নাই এবং যারা এটা সঙ্গে জড়িত ছিল না তাদেরকে আমরা দেখলাম যে একটা সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে উঠে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তারা গেলেন। একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় গেছেন কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাবে যে কতগুলো ক্ষতি হয়েছে সেগুলো এখনও পর্যন্ত পৌঁছানো যায়নি বলে আমার ধারণা। এই সময়টায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অসংখ্য দুঃখ কষ্টের মধ্যে ছিল। আপনার ২১ বছর। ২১ বছর বেশিও হতো না কারণ আপনার ৮১ সালে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন এর সঙ্গে কিছু এনালজি ড্র করেছেন আমি আরেকটা একটু যোগ করব ছয় দফা যখন হয় ৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সব বড় নেতারা কিন্তু চলে গেছিলেন সালাম খান থেকে শুরু করে সবাই। এবং তখন ১৭টা ডিস্ট্রিক্ট ছিল ইস্ট পাকিস্তানে। তার ১৫ ডিস্ট্রিক্টের প্রেসিডেন্ট চলে গেছিলেন। তাহলে সেই ৬ দফাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগকে আবার ৭০ সালের ইলেকশনের মধ্যে এনে এই যে পাকিস্তান পর্বের এক পর্ব শেষ করলেন এর মধ্যে অনেক কষ্ট তাকে করতে হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীসহই। উনি ঠিকই বলেছেন শেখ হাসিনা যখন দলের নেতৃত্ব ধরলেন তখন আওয়ামী লীগ খণ্ড-বিখণ্ড, রাজনৈতিক চিন্তাহীন। একদল বলে যে বাকশাল করাই ঠিক আছে, আরেকদল বলে যে বাকশাল এর জন্য সরি বলতে হবে। এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কিন্তু শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগকে পুনঃসংগঠিত করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো আজকের আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের মধ্যে চ্যালেঞ্জ তো অন্য উনাকি এটা বলতে হবে আর সেটা অন্য কথা। ৭১ সালের মার্চ মাসে আমি এটা পড়ে বলে বরং এই ঘটনাটা আওয়ামী লীগের রাজনীতির ট্রেডিশনের মধ্যে যে কারণে মানুষ অন্তর দিয়ে সাহায্য করেছে, সমর্থন দিয়েছে, তার জন্য মরেছে তার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করে সফল হয়েছে তার তো কতগুলো প্রমিসেস ছিল। এখন খুবই বাজে অবস্থায় আছে এটাই আওয়ামী লীগের ৭২ বছরের চ্যালেঞ্জ। নেতৃত্বকে নতুন করে চিন্তা করলে তার আমি মনে করব উপকৃত হবেন কি করছো এবং বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হবেন। এক নম্বর হচ্ছে দেশে যে ভোটাধিকার সার্বজনীন ভোটাধিকারের জন্য আওয়ামীলীগ বছরের পর বছর লড়াই করেছে। বাকশাল হওয়ার পরে যে পুনর্জীবিত আওয়ামী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সেটাও করেছে এবং পাকিস্তানী আমল ধরে করেছে। বাংলাদেশে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলে দুইটা গত ন্যাশনাল ইলেকশনে এটা প্রমাণিত হয় নাই। মানুষের ভোট দেওয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে এবং সে কারণে সমাজে একটা বিশালভাবে একটা ডিপলিটিসেশন হইছে আওয়ামী লীগের ভিতরে ডিপলিটিসেশন হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। আপনার পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ী, আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলেও তাই হয়েছে। আপনার দখল করে নিয়ে যাচ্ছে এটা দেশের জন্য এবং আওয়ামী

লীগের জন্য ক্ষতিকর। দুই নম্বর হচ্ছে অপজিশন। অপজিশন ছাড়া যে গণতন্ত্র হয়না এটাতো মুজিব বারবার বলেছেন তাঁর লেখার মধ্যে আছে। আর উনি যদি নাও বলতেন তাও পৃথিবীতে এটাই সত্য। সেই অপজিশনটাকে অপারেট করতে ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। এটা তার জন্য ক্ষতিকর একদিক দিয়ে এবংদেশের জন্য ক্ষতিকর তো বটেই। আমি ছোট্ট একটা কথা বলি ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে যখন আপনার ডায়ালগ চলছে তখন শেখ সাহেব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটকে যেটা পরবর্তীকালে বেরিয়েছে কারণ তাকে তো ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করতে হয়। উনি বলেছেন পাকিস্তানের রাজনীতিতে গোয়েন্দারা যেভাবে ইন্টারফেয়ার করা শুরু করেছে এটা যদি চলতে থাকে তাহলে আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করব। এখনও করছি না যে কারণে মানিসটরা টেকওভার করতে পারে ভিয়েতনাম স্টাইলে অর্থাৎ রাজনীতিকরাই রাজনীতি করবেন। এইযে নানান বাহিনীর গোয়েন্দা বাহিনীর বাংলাদেশের রাজনীতিতে বহু বছর ধরে নানান ভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন আমি যদি শেখ মুজিবের আদর্শ এবং রাজনীতির কথা বলেন,তাকে যদি সম্মান করেন এই কথাটা তাহলে বলতে পারে মিলিটারি আমলে শুরু হয়েছে হয়তো তাই কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে আওয়ামী লীগ কিন্তু বছর ক্ষমতায় এখন। ওই প্রভাব থেকে বের করে এনে রাজনীতিটিতা রাজনীতিকদের হাতে রেখে মানুষের অংশগ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে, অপোজিশন কে অপারেট করার ক্ষমতা দিয়ে একটা ভাইবরেন্ট মিডিয়াম ব্যবস্থা রেখে যদি রাজনীতিটা করে তাহলে তার যে আওয়ামী লীগের ৭২ বছর আগের জন্মের যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং ন্যায্যটা সেই মূল স্পিরিট গুলোর মধ্যে যদি ফিরে যায় তাহলে দেশের জন্য ভালো আওয়ামী লীগের জন্য ভালো।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার শ. ম. রেজাউল করিম।

শ. ম. রেজাউল করিমঃ এখানে বিতর্ক নয় আমার জায়গা থেকে আমার যেটা মনে হয় সেটা হলো বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরেই কিন্তু এদেশের রাজনীতি মানে প্রগতিশীল রাজনীতির ও কিন্তু দুটো ধারা ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন একটি ধারা, রাজনীতির বাইরেও কিন্তু একটা ধারা ছিল মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ বিশেষ করে তাদের একটা অংশ ছিল চাইনিজ সমাজতন্ত্রের দিকে। প্রফেসর মোজাফফর সাহেবের নেতৃত্বাধীন মোজাফফর ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি আরেকটা গ্রুপ ছিল। ডাইরেক্ট রাজনীতিতে তারা আসতো না কিন্তু তারা অনেক থিসিস, টিসিস দিত। বিভিন্ন রকম তত্ত্ব এখনই, লাল বইটি অনেক রকম। সেই রাজনীতিতেও তাদের একটা কনসেপ্ট ছিল। রাজনীতিতে একটা সময় ন্যাপ মোজাফফর প্রতি ইউনিয়নে পর্যন্ত ওই কুঁড়েঘর মার্কা নির্বাচনে অথবা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান যে ব্লগটা তারাও কিন্তু ইউনিয়ন

পর্যায়ে কিন্তু পৌছে গেছিল। যারা বুঝত না তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা সম্মোহিত জায়গা ছিল। শ্রেণি শত্রু খতম হওয়া, অথবা সমাজতন্ত্র কায়েম করা। দুইটা ফোরাম দুইরকম ছিল। সেই রাজনীতি কিন্তু বিকশিত করে নিজেদেরকে রাজনীতির জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নাই। তখন কিন্তু আবার নতুন করে আরেকটা ধারা সৃষ্টি হল অতি উগ্র রাজনীতি যেটা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নাম। যদি অভিযোগ আছে যে তারা নিজেরা নিজেদের সৃষ্টি না। কেউ অন্যের কারো সাথে এরকম একটা ফোরাম তৈরি করে দিয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করা বড় একটি অংশই কিন্তু বিভাজিত হয়ে গেল। ফলে স্ট্রং পলিটিক্যাল অপজিশন যেটা সেটা কিন্তু বাংলাদেশে ডেভলপ হয় নাই। আমার ধারণা যে তারা বাস্তবতা সম্মত চিন্তা-চেতনা না করায় ৭৫ এর ১৫ আগস্টের পরে বঙ্গবন্ধু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরে কিন্তু সেই সকল রাজনীতির আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যেটা কবির ভাই টেকনিক্যালি কিছু বলেছেন। বিসর্জন দিয়ে অনেকেই কিন্তু তাদের রাজনীতির বাইরে যে রাজনৈতিক সামরিক শাসকদের সেখানে মিলে গিয়ে তার রাজনীতি টোটাল বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার হালুয়া রুটি ভাগ করতে সেখানে চলে গেল। আমি একজন রাজনৈতিক নেতার মামলায় ছিলাম তিনি একসময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিজীবনে সৎ মানুষ। আমি তার মামলা করেছি সেজন্য বলি আমার রাজনীতির বাইরের মানুষ তিনি তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে সারাজীবন বললেন তাত্ত্বিক রাজনীতির কথা যোগদান করলেন জিয়াউর রহমানের সাথে তারপর এরশাদের সাথে কেন। তিনি বললেন দেখো বাংলাদেশের তাত্ত্বিক রাজনীতি টঙ্গীর মেহনতী মানুষের ওখান থেকে চা এক কাপ এনে পাঁচজন খাবো। আলটিমেটলি তো কিছু করা যাচ্ছে না। একটা বড় স্রোতে গিয়ে কিছু হয়তো বা কন্ট্রিবিউট করতে পারব। এটা তাদের একটা সমঝোতা জাতীয় কনস্ট্রেপশন থেকে তারা সেখানে চলে গেল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আসার পরে বিরোধী দলীয় রাজনীতি কে কখনোই তিনি অপোস করা বা অপরেশনের ভিতরে তিনি রাখতে চাননি। কিন্তু সিচুয়েশন অথবা ওই রাজনীতির উগ্র চক্ররা কিন্তু হরেন ২০১৪ সালে নির্বাচন যে কেউ বয়কট করতে। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাচন বয়কট করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন প্রতিহত নামক শব্দটা দিয়ে যে উগ্রতার ভিতরে জায়গাটা নিয়ে আসছিলেন তখন কিন্তু রাজনীতি বিরোধীদলীয় জায়গাটা চাঙ্গা করে মানুষের ইমেজের জায়গাটা তাদের চাহিদা মেটানোর জায়গাটাও তারা ডেভলপ করতে পারে নাই। আমি একটু থামিয়ে দিয়ে আপনাকে কারণ আমি একবারে শেষ পর্যায়ে।

জিল্লুর রহমানঃমিস্টার নূরুল কবির জাস্ট দুই মিনিট সময় শেষ করবার জন্যে।

নূরুল কবিরঃ রাজনীতিবিদের তো নানান সমস্যা ছিলই এখনো আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা পার্টি যে পার্টি বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে গণতন্ত্রের কথা বলে এবং কথায় কথায় মুজিবের কথা বলে রাইটলি কিন্তু তা লিখিত বক্তব্য যা আছে আগস্ট মাসে অনুসরণ করবার কথা সেগুলো না করে যদি পার্টিটা সব ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ যেগুলো আছে সেগুলোর উপর ন্যায্যতা আরোপ করবার জন্যে উদাহরণ টানলে টানতে পারে। অন্যরা তো ভুল করেছে ভুল না করলে তাদের এই অবস্থা হবে কেন কিন্তু আমি বলছি যে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতিতে এই বাংলাদেশ সমাজ এবং রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর দরকার। এই রূপান্তরে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ এখনো সময় আছে যে আপনার ভূমিকা রাখবার। যদি তার ইতিহাসের প্রতি মানে ইতিহাসের অন্তত কতগুলো সোনালী সময়ের প্রতি ইতিহাসে পুরোটাই আপনার সোনালী সময় নয় এটা একদলীয় শাসনব্যবস্থা, আপনার অপজিশন নিপীড়ন ইতিহাস তারও আছে যেমন অন্যদেরও আছে। আমি মনে করি এই চ্যালেঞ্জগুলো তার সামনে আছে। ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার বৈষম্য কমানো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পার্টিগুলো মধ্যে সমাজের মধ্যে এবং স্বাধীনতার স্পিরিট যেটা সাম্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আপনার গণতন্ত্র প্লাস নাগরিকের যে ব্যক্তি মর্যাদা এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আওয়ামী লীগ যদি মনোযোগ দেয় এবং সেটা আওয়ামীলীগের জন্য ভালো আমাদের জন্য ভাল। এটা আমার বক্তব্য।

জিল্লুর রহমানঃ জি

শ. ম. রেজাউল করিমঃদেখুন এই জায়গায় আমি তার সঙ্গে একমত তার মৌলিক যে উদ্দেশ্যের জায়গাটা আমিও মনে করি আওয়ামী লীগ এই জাতিকে যা দিয়েছে ফলে আওয়ামী লীগের এই জাতির জন্য দায় রয়েছে। আওয়ামী লীগের আহবানে মানুষ শর্ত দিয়ে দিয়েছে ফলে এই জাতিকে যত প্রকার ফ্যাসিলিটিজ দেওয়া, তার গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিশ্চিত করা, রাজনীতিকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, গুণগত পরিবর্তনের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দায়ও আওয়ামীলীগে রয়েছে। কিন্তু আওয়ামীলীগ একটি মাল্টি ক্লাস পলিটিক্যাল অরগানাইজেশন। নানা শ্রেণীঅ, নানা পেশা্ নানা মতের মানুষও কিন্তু এখানে প্রবেশ রয়েছে। তার ভেতর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন যে রাজনীতিকে রাজনীতিকরণের জায়গায় যেমন দলের ভেতর দেখবেন আমরা যারা পার্ট্রিসেন্ট্রাল লিডার ছিলাম আমাদের অনেককেই কিন্তু রাখা হয়নি। বলা হয়েছে না পার্টি এবং সরকারকে একাকার করা ঠিক হবে না। আবার তিনি যখন বিরোধী কারো সাথে কথা বলেন যেমন সংলাপ করেন আমি অনেক সময় থেকেও দেখছি তার কিন্তু এই সংবেদনশীল মানসিকতাটা আছে। তিনি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত

আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচার এটাকে বারবার রেফার করে তার দলের লোকদের কেউও বলেন ভালো হও। দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হইও না। সব কিছু নিজে পলিটি সাইস করো না। তিনিও বলেঅ। সেই জায়গাটার উত্তরণ আমিও মনে করি কারণ আওয়ামী লীগ যদি কিছু না দিতে পারে হলে মানুষ যে অভিযোগটা করবে এই অভিযোগটা আওয়ামী লীগকে ক্যারি করতে হবে কারণ অন্য হঠাৎ করে সৃষ্টি হওয়া দল বা সামরিক শাসকদের দল তার আর আওয়ামী লীগের জায়গা এক্ষেত্রে না। একজন নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগকে আরো যত সম্ভব রাজনীতিকে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা কার্যত সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা সুযোগ আছে সেই সুযোগ আওয়ামী লীগকে নিশ্চিত করতে হবে। এবং আমার বিশ্বাস যে আওয়ামী লীগ সেটা করার অগ্রযাত্রায় আছে এবং ইনশাল্লাহ আওয়ামী লীগ করবে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি খুব কাছে থেকে দেখে অন্তত তাকে কেন্দ্র করে আমি বলবো যদিও কথাটা দলের ব্যক্তিকর জায়গা না তিনি যেই জায়গায় আছেন তিনি এখন একটা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন। আকাঙ্ক্ষার কথাটা নূরুল কবির বললেন এই আকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হোক এটা শেখ হাসিনা চান।

নূরুল কবিরঃ তার জন্যে বিতর্কিত ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের জন্য সম্মানজনক না। আওয়ামী লীগের সম্মানের জন্য এটা দরকার।

শ. ম. রেজাউল করিমঃনা বিতর্কিত ভোটের প্রশ্নটা হলো কি আপনি ধরেন ১৪ সালের নির্বাচন আপনি আসলে না তখন কি করার ছিল। আবার স্ট্রং বিরোধীদল হলে কিছুই করতে পারে না আওয়ামী লীগের যে দীর্ঘ ধারাবাহিকতা বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির হুকুম হয়েছে তারপর সে সমঝোতা করেনি। বিল্লুর রহমানের মতো লোক মতিয়া চৌধুরী মতো লোক ড্রেনের ভেতর পরে গেছে। শেখ হাসিনা একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাও স্যালেন্ডার করেনি। এরকম পলিটিক্যাল অ্যাটিটিউড, আইডিওলজি, ডিটারমিনেশন কিন্তু বাইরের লোকদের থাকলেও এই জায়গায় এক্সপ্রেস হয়। বাইরের লোক না থাকলে তো ফাঁকা মাঠ হয়ে যায়।

নূরুল কবিরঃ সেটা পলিটিক্যাল পার্টির জন্য শেষ পর্যন্ত বিপদজনক। আমার কথাটা আমি যেটা আমি বুঝেছি আপনাকে বললাম যে আমি একটা নাগরিক হিসেবে আশা করি রাজনীতি তার স্বতন্ত্র জায়গায় থাকুক। রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকুক। শত্রুতা নয়। প্রতিদ্বন্দী হোক রাজনীতি। আমাদের কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু আমরা ভুলে যেতে পারিনা কি সহিংসতা ভেতর থেকে রাজনীতি গেছে বঙ্গবন্ধুকে খুনের পরে তাদেরকে পূর্ণ প্রোভাইড করা, শেখ হাসিনাকে মারার জন্য

চেষ্টা করা, ২১ আগস্টের ঘটনাএর পরেও কিন্তু শেখ হাসিনা সকলকে আলিঙ্গন করে রাজনীতি করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাক, ইমেইল এসএমএসের মাধ্যমে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের যে সকল পেইজ রয়েছে সেই সব পেইজে আপনারা মতামত রাখতে পারেন। আর আপনারা আপনাদের মতামতি অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয়, সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটায়, শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল। তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন। তৃতীয় মাত্রার পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন। ফেইসবুক এখন তৃতীয় মাত্রার লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। আই ও এস ডিভাইস অ্যাপ স্টোর থেকে আপনি তৃতীয় মাত্রার অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথ্যাদি জানবার জন্য নূরুল কবির এবং রেজাউল করিম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের দুইজনকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। দর্শক কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের সবচাইতে পুরনো রাজনীতিক দল অন্তত সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তো বটেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রথম ২২,২৩ বছরের যে অর্জন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে মানের রাজনীতি সে করেছে পরের ৫০ বছরের সেই রাজনীতিতা ধরে রাখতে পেরেছে কিনা এই দলটি এটিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এবং সে কারণেই আলোচনার মধ্যে সে কথা উঠে এসেছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্মের যে অঙ্গীকার বা তার যে সোনালী সময় সে সোনালী সময় ১৯৭০, ৭১ বা ৬৯ সেই সময়কার যে অঙ্গীকার গুলো সেগুলো সে বাস্তবায়ন করতে পারছে কিনা এই ৫০বছরে এবং টানা দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকবার রেকর্ড বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বেশি ক্ষমতায় থাকবার রেকর্ড সত্বেও সেটি তার জন্য সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ । দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।